ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৩

৯ম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২৬
বৈশাখ	১৪১২
মে	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

اسلام كا نظريه اخلاق -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMER NOYTIK DRISHTIKON by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 8.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন-নদী যখন ধীর-স্থীর-মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়, তখন মানুষ এক ধরনের নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। কেননা উপরিভাগটা হয়ে যায় স্বচ্ছ আবরণের মতো। ময়লা, আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ এর নীচে স্তরে স্তরে জমা হয়ে আত্মগোপন করে থাকে। আবরণের ওপরের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতায় মানুষ ভেতরের দিকে দৃষ্টি দেবার এবং আবরণের নীচের স্তরগুলোর মধ্যে আত্মগোপনকারী বস্তুকে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা খুব কমই অনুভব করে। কিন্তু যখন এই নদীতে তুফান আসে এবং নীচের আত্মগোপনকারী সমস্ত আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ আচানক ভেসে উঠে নদীর উপরিভাগে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন একমাত্র অন্ধ ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই যার চোখে ক্ষীণতম দৃষ্টিশক্তিও আছে—নির্বিঘ্নে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পায় যে, জীবন নদী কত সব আবর্জনা বুকে নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতেই সাধারণ লোক জীবন নদীতে প্রবাহিত এই আবর্জনার উৎস অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে। একে আবর্জনামুক্ত করার এবং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার রাখার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করার সুযোগও তারা পায়। সত্যি বলতে কি, এমন উল্লেখ্য মুহূর্তেও যদি মানুষের মনে এ প্রয়োজনের অনুভূতি জাগ্রত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, মানব জাতি গাফলতির নেশায় বিভোর হয়ে লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

আজ আমরা ঠিক এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। জীবন-নদীতে বান ডেকেছে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে। এ সংঘর্ষ এতো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে যে, বড় বড় সমাজ-সমষ্টির সীমা পেরিয়ে ব্যক্তিকেও এর মধ্যে টেনে এনেছে। এভাবে মানবজগতের বিভিন্ন অংশ তাদের সমস্ত নৈতিক গুণাবলী—যেগুলোকে তারা দীর্ঘকাল থেকে ভেতরে ভেতরে জিইয়ে রেখেছিল—উদগীরণ করে জনসমক্ষে রেখে দিয়েছে।

যেসব আবর্জনার অনুসন্ধানের জন্যে কিছু না কিছু গভীর দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, এখন সেগুলোকে আমরা দেখছি জীবন-নদীর উপরিভাগে। রোগীর অবস্থা

প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজে পঠিত হয়।

ভালো, একথা কোন জন্মান্ধই বলতে পারে। যারা পশুর মতো নৈতিক অনুভূতিহীন অথবা যাদের নৈতিক অনুভূতি জরাগ্রস্ত কেবল তারাই এখন রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসার চিন্তা থেকে গাফেল থাকতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক জাতি সামগ্রিকভাবে ব্যাপকহারে এমন সব নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিকতা বিরোধী কাজের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে, যেগুলোকে মানুষের বিবেক হামেশা অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, যুলুম, নির্যাতন, মিথ্যা, প্রতারণা, প্ররোচনা, ওয়াদাভংগ, নির্লজ্জতা, স্বার্থপূজা, আমানতের খেয়ানত, অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ এবং এ ধরনের অন্যান্য অপরাধ আজ আর নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ থাকেনি, এগুলোর মাধ্যমে আজ জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ ঘটছে। দুনিয়ার বড়ো বড়ো জাতিরা সামগ্রিকভাবে এমন সব কাজ করে যাচ্ছে, যা পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের অপরাধে তাদের দেশের জনগণকে আজো লৌহ কপাটের অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক জাতি বেছে বেছে তার সবচেয়ে বড়ো অপরাধীগণকে নিজের নেতা ও শাসক পদে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি প্রকাশ্যভাবে নেহায়েত নির্লজ্জতার সংগে ব্যাপকহারে দুনিয়ার যাবতীয় নিকৃষ্টতম অপরাধ অনুষ্ঠানে ব্রত হয়েছে। প্রত্যেক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে স্তুপীকৃত মিথ্যার ইতিহাস রচনা করে প্রকাশ্যভাবে তা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমে এ মিথ্যাগুলো আকাশ-বাতাস দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। এক একটি দেশ ও মহাদেশের সমগ্র অধিবাসী লুঠতরাজকারী এবং দস্যুতে পরিণত হয়েছে। দস্যুবৃত্তি করার সময় প্রত্যেক দস্যু চরম নির্লজ্জতার সংগে তার বিরোধী দস্যুর যাবতীয় পাপ কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে, যে পাপে সে নিজেও তার প্রতিদ্বন্দ্বির তুলনায় কিছু কম নিমজ্জিত নয়। এ জালেমদের নিকট ইনসাফের অর্থ হলো, শুধু নিজের জাতির সংগে ইনসাফ করা। নিজের জাতির অধিকারই শুধু সংরক্ষিত থাকবে। অন্যের অধিকারের ওপর সব রকমের হস্তক্ষেপ তাদের নৈতিক বিধানে শুধু বৈধই নয়, নেকীর কাজও। দুনিয়ার প্রায় সমস্ত জাতিই এখন নেবার এবং দেবার সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ ব্যবহার করছে। নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের সময় তারা যেসব মাপকাঠি নির্ণয় করে অন্যের বেলায় সেসব পরিবর্তিত হয়ে যায়। অন্যের কাছ থেকে তারা যেসব মানদন্ডের দাবী করে সেগুলো মেনে চলা নিজেদের জন্যে হারাম মনে করে। ওয়াদাভংগ করার ব্যধি এমন ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, এক জাতির প্রতিনিধিবর্গ অত্যন্ত ভদ্র বেশে যখন আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর দস্তখত করেন, তখনো তাদের মনের কোণে এ শয়তানী ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে যে, প্রথম সুযোগেই জাতীয় স্বার্থের কোরবানগাহে এ পবিত্র ছাগ শিশুটির গলায় ছুরি চালিয়ে দেবো এবং যখন

কোন জাতির প্রেসিডেন্ট অথবা উজিরে আজম এ উদ্দেশ্যে ছুরিতে শান দিতে থাকেন তখন এ শয়তানী কাজের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও সমগ্র জাতির মধ্য হতে উত্থিত হয় না। বরং সমগ্র দেশবাসী এ অপরাধে অংশগ্রহণ করে।

সমগ্র দুনিয়াকে প্রতারিত করা হচ্ছে। বড়ো বড়ো উন্নত, পবিত্র, নৈতিক বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয় শুধু মানুষকে বেকুব বানিয়ে স্বার্থোদ্ধার করার জন্যে। সরল-মনা লোকদেরকে বুঝানো হয় যে, আমাদের নিজেদের স্বার্থে তোমাদের কাছ থেকে জান-মালের কুরবানী দাবী করছি না, বরং নিছক মানবতার স্বার্থেই আমরা সৎ এবং নিস্বার্থ সমাজসেবীরা এ কষ্ট সহ্য করছি।

অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। একটি দেশ যখন অন্য দেশের ওপর আক্রমণ করে তখন শুধু অনুভূতিহীন ষ্টীমরোলারের মতো আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদেরকে পিষে গুড়ো করেই ক্ষান্ত হয় না বরং আনন্দের সংগে সমগ্র দুনিয়ায় তার এ কার্যাবলী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে। তার রকম-সকম দেখে মনে হয়, দুনিয়া থেকে যেন মানুষের বাস ওঠে গেছে। এখন বুঝি শুধু মানুষ খেকো নেকড়েরই আধিপত্য।

স্বার্থান্ধ হৃদয়হীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। একটি জাতি নিছক নিজের স্বার্থে অন্য জাতিকে পদানত করার পর শুধু নির্দয়ভাবে তার সম্পদ লুট করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তার যাবতীয় উন্নত মানবীয় গুণাবলী বিনষ্ট করে। সাম্ভাব্য সকল রকমের দোষ এবং নিকৃষ্টতর অপরাধ প্রবণতা—যেগুলোকে সে নিজেও অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে—তার মধ্যে সৃষ্টি করে এবং এ জন্যে সে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ অভিযান চালায়।

এখানে নিছক কতিপয় উল্লেখযোগ্য নৈতিক ত্রুটির নমুনা দেখালাম। নয়তো বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নৈতিক দিক দিয়ে সমগ্র মানবতার দেহ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক সময় বেশ্যালয় এবং জুয়ার আড্ডাকে নৈতিক অবনতির সবচেয়ে বড়ো ফোঁড়া মনে করা হতো। কিন্তু আজ যে দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়, সমগ্র মানব সভ্যতা একটি ফোঁড়ার আকারেই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন জাতির পার্লামেন্ট এবং জাতীয় পরিষদ, রাষ্ট্রের সেক্রেটারীয়েট এবং উজির-নিকেতন, আদালাতের বিচার কক্ষ ও উকিলের মন্ত্রণাগার, প্রেস, প্রচার দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ সমস্তই এক একটি পাকা ফোঁড়ার মতো। এ ফোঁড়াগুলো যেন একটা শানিত ছুরির অপেক্ষায় আছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো এই যে, যে জ্ঞান মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে বিবেচিত হয়, আজ তাকে মানবজাতির সকল দিকের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃতি যে শক্তি-সম্পদ এবং জীবনের উপায়-উপকরণ মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি করেছিল, আজ তা বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। সাহসিকতা, ত্যাগ,

কুরবানী, দানশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, হিম্মত, বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রভৃতি যেসব গুণাবলীকে মানুষের শ্রেষ্ঠ এবং উন্নততর নৈতিক গুণাবলী মনে করা হতো সেগুলোকেও আজ কতিপয় মৌলিক নৈতিকতা বিরোধী দুষ্কর্মের দাসে পরিণত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত ত্রুটি যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় তখনই এসব সামগ্রিক ত্রুটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আপনি একথা চিন্তাও করতে পারবেন না যে, কোন সমাজের অধিকাংশ লোক সৎ হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সেখানে অসৎ প্রবণতার বিকাশ ঘটবে। সৎ লোকেরা তাদের নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অসৎ লোকদের হাতে তুলে দেবে এবং তারা তাদের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার অনৈতিক বিধান মোতাবিক পরিচালিত করবে আর ঐ সৎলোকেরা তাদের এসব কার্যকলাপের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে, এ কখনো সম্ভবপর নয়। কাজেই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি যখন আজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব নিকৃষ্টতর অনৈতিকতার প্রকাশ করছে, তখন এথেকে প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তমদ্দুনের যাবতীয় উন্নতি সত্ত্বেও মানবজাতি নৈতিক অবনতির গভীরে পদক্ষেপ করেছে এবং অধিকাংশ মানুষ এতে প্রতারিত হয়েছে। এ পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে মানবতা একটি বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখী হবে এবং এক সুবিস্তীর্ণ তমসার আড়ালে ঢেকে যাবে তার সমগ্র ইতিহাস।

যদি আমরা চোখ বন্ধ করে বেধড়ক ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে না চাই তাহলে আমাদের এ ত্রুটির সন্ধানে বেরুতে হবে, দেখতে হবে কোথেকে তুফানের বেগে এগুলো বয়ে চলে আসছে। যেহেতু এগুলো নৈতিক ত্রুটি, তাই এর সন্ধান পাবো আমরা দুনিয়ায় বর্তমানে প্রচলিত নৈতিক চিন্তা-ধারণার মধ্যে।

দুনিয়ার নৈতিক চিন্তা-ধারণা কি ? এ প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করার পর আমরা জানতে পারি যে, নীতিগতভাবে সমস্ত চিন্তা-ধারণা দু'টো বৃহত্তম ভাগে বিভক্ত।

একটি চিন্তার ভিত্তি হলো আল্লাহ্ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের ওপর। দ্বিতীয়টির ভিত্তি এসব বিশ্বাস থেকে পৃথক অন্য কোন বুনিয়াদের ওপর রাখা হয়েছে।

আসুন, এখন আমরা এ দু'ধরনের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখি, বর্তমানে এগুলো দুনিয়ায় কি অবস্থায় আছে এবং এর পরিণাম কি হচ্ছে। আল্লাহ্ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের ওপর যতগুলো নৈতিক চিন্তার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, এ সবগুলোর আকৃতি আল্লাহ্ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ধরনের বিশ্বাস পাওয়া যায়, তার ওপর নির্ভর করে।

কাজেই আমাদের দেখতে হবে বর্তমানে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে কোন্ আকৃতিতে মেনে নিয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের সাধারণ ধারণা কি ?

আল্লাহকে যারা মেনে নিয়েছে বর্তমানে তাদের অধিকাংশই শির্কের মধ্যে লিপ্ত আছে। তাদের জীবনের সংগে আল্লাহর যে সমস্ত ইখতিয়ারের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোকে তারা ইচ্ছামতো অন্যান্য সত্তার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। এবং নিজেদের মনের মতো করে তারা ঐসব সত্তার এমন কাল্পনিক চিত্র বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা তাদের খোদায়ীর ইখতিয়ারগুলো ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করছে, যেভাবে তারা ব্যবহার করতে চায়।

এরা গোনাহ করে এবং তারা মাফ করে দেয়। এরা কর্তব্যে গাফেল হয়ে অধিকার অনধিকারের সীমা লংঘন করে এবং হালাল হারামের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে দুনিয়ার খেত-খামারে বল্গাহারা অশ্বের মতো ছুটে বেড়ায় আর তারা যৎসামান্য নজরানা গ্রহণ করে এদের মুক্তির জামীন হয়ে যায়। এরা চুরি করতে বেরুলে তাদের মেহেরবানীতে থানার দারোগা পুলিশ ঘুমিয়ে পড়ে। এদের এবং তাদের মধ্যে এভাবে সওদাবাজী হয়েছে যে, এরা তাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে ও নজরানা পেশ করতে থাকবে এবং এর প্রত্যুত্তরে তারা এদের যাবতীয় কাজ, যা এরা করতে চায় সবকিছুই সুসম্পন্ন করে যাবে ও মৃত্যুর পর যখন আল্লাহ এদের শাস্তি দিতে চাবেন, তখন তারা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, হে আল্লাহ, এরা আমাদের ছায়াতলে আছে, এদেরকে কিছুই বলবেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার প্রয়োজনই হবে না। কেননা এদের গোনাহর কাফফারা পূর্বেই একজন আদায় করে দিয়েছেন। এ শির্ক মিশ্রিত বিশ্বাস মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের ধারণাকেও অর্থহীন করে দিয়েছে। এর ফলে ধর্ম যেসব নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল, তা সবই অন্তসারশূন্য হয়ে গেছে। ধর্মীয় নৈতিকতার বই-পত্র লিখিত রয়েছে। সম্মানের সংগে এগুলোর নামোচ্চরণ করা হয়। কিন্তু কার্যত এর বাঁধন এড়িয়ে চলার জন্যে শির্ক অসংখ্য চোরা দরজার ব্যবস্থা করেছে। এ ব্যবস্থার মধ্যে খুঁত বের করা সহজ ব্যাপার নয়। যে কোন দরজা দিয়ে বেরুলেই নিশ্চিন্তে নাজাতের মঞ্জিলে পৌঁছুনো যায়।

শির্কের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা এমন জায়গার কথা আলোচনা করি, যেখানে আল্লাহপরস্তি এবং আখেরাতের বিশ্বাস কিছুটা উন্নত পর্যায়ে অবস্থান করছে, তাহলে দেখতে পাবো যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী সেখানে জীবনের একটি ক্ষুদ্রতম গন্ডীর মধ্যে সংকুচিত হয়ে রয়েছে। কয়েকটা কাজ, কয়েকটা রসম-রেওয়াজ আর কয়েকটা বিধি-নিষেধেরই শুধু সেখানে অস্তিত্ব রয়েছে। আল্লাহ সেখানে এগুলোর দাবী করেন মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সীমিত পরিসরে। এবং এগুলোর বিনিময়ে তিনি তাদের জন্যে একটি বিরাট বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন। তারা শুধু এ দাবীগুলো পূর্ণ করলেই হলো, ব্যাস,

তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে আর তাদের জন্যে করার মতো কিছু বাকী থেকে যায় না। এরপর তারা নিজেদের জীবনের যাবতীয় ব্যাপার ইচ্ছামতো চালাতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই। এতো সবকিছুর পরও যদি আল্লাহর ঐ দাবী পূরণের ব্যাপারে তাদের কিছু ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে তাঁর মেহেরবানী এবং করুণার ওপর নির্ভর করা যায়। তিনি গোনাহর স্তূপগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে জান্নাতের দরজায় রেখে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সম্মানসূচক টিকেট দান করবেন। এ সংকীর্ণ ধর্মীয় ধারণা প্রথমত জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নৈতিকতার গতিকে সীমাবদ্ধ নেতৃত্ব এবং বিধি-নিষেধ লাভ করা যেতো, জীবনের যাবতীয় বৃহত্তম অংশ তাথেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এ সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যেও নৈতিকতার বাঁধন এড়িয়ে চলার জন্যে একটা পথ খোলা রয়েছে। খুব কম লোকই এ সুযোগটি ব্যবহারের ব্যাপারে গড়িমসি করে।

উপরে যে শ্রেণীগুলোর কথা আলোচনা করা হলো এদের সবার চেয়ে যে ধর্মীয় শ্রেণীটি উন্নততর পর্যায়ে অবস্থান করছে, যার মধ্যে শির্কের ছিটেফোটাও নেই, আন্তরিকতার সংগে আল্লাহকে মেনে চলে এবং মৃত্যুপারের জীবন সম্পর্কে কোন মিথ্যা নির্ভরশীলতার তোয়াক্কা রাখে না, তার মধ্যে অবশ্যি নির্ভেজাল নৈতিকতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় এবং উন্নত চরিত্রের লোকের সন্ধান তার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সীমিত ধারণাই তাদেরকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সমস্যা হতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন হয়ে কতিপয় বিশেষ কাজকে—যেগুলোকে ধর্মীয় কাজ মনে করা হয়—আগলিয়ে বসে রয়েছে। অথবা নিজেদের আত্মাকে মেঝেঘসে সাফ করছে যাতে করে এ দুনিয়ায় বসে তারা অদৃশ্য জগতের আওয়াজ শুনতে পারে এবং সৌন্দর্যের প্রতীক স্রষ্টার এক ঝলক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা মনে করে মুক্তির পথ বেরিয়ে গেছে পার্থিব জীবনের কিনারা ঘেঁসে। তাদের মতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ হলো একদিকে ধর্ম যে নকশা এঁকে দিয়েছে জীবনের বাইরের অংশটিকে সেই ছাঁচে ঢালাই করতে হবে এবং অন্যদিকে আত্মশুদ্ধির কতিপয় পদ্ধতি এখতিয়ার করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অতপর একটি সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে কতিপয় আধ্যাত্মিক কাজে মশগুল থেকে জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে যেতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, তাদের আল্লাহর প্রয়োজন ছিল কতিপয় ঝকমকে তকতকে কাঁচ পাত্রের, কতিপয় জোরদার লাউড স্পীকারের, কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রামোফোনের, কতিপয় সূক্ষ্মতর ক্ষমতা বিশিষ্ট রেডিওর, কতিপয় সুদৃশ্য ক্যামেরার এবং একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তিনি এতগুলো সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ নিজেদেরকে এসব বস্তুতে রূপান্তরিত করে তাঁর নিকট ফিরে যেতে পারে। ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ভ্রান্ত ধারণার ফলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি

হয়েছে তাহলো এই যে, যেসব মানুষ উন্নত এবং পবিত্রতর নৈতিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, তাদেরকে জীবনের বিস্তৃত সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গৃহকোণে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকদের জন্যে বিনা যুদ্ধেই ময়দান খালি করে দেয়া হয়েছে।

সমগ্র দুনিয়ার ধর্মীয় পরিস্থিতির একটা মোটামুটি চিত্র এখানে আঁকা হলো। এথেকে আপনারা ধারণা করতে পারেন যে, আল্লাহ পরস্তির ফলে মানুষের যে নৈতিক শক্তি লাভ করার সম্ভাবনা ছিল, বেশীর ভাগ মানুষ তা আদতে হাসিলই করছে না এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক তা হাসিল করছে। কিন্তু মানবজাতির নেতৃত্বের পথ থেকে তারা নিজেরাই সরে এসেছে। এ জন্যে তাদের অবস্থা বর্তমানে ঠিক সেই বালবের মতো যার মধ্যে বিজলীর ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে। আর সে বসে বসেই নিজের জীবনকাল অতিবাহিত করছে।

মানব সভ্যতার গাড়ি বর্তমানে যাদের সাহায্যে কার্যত পরিচালিত হচ্ছে, তাদের নৈতিক জগতে আল্লাহ ও আখেরাতের বুনিয়াদি ধারণার ঠাঁই নেই। জেনে বুঝেই সেখানে ঠাঁই দেয়া হয়নি। এ ছাড়াও নৈতিক জগতে আল্লাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তারা পুরোপুরি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অবশ্যি তাদের মধ্যে বহু লোক কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। কিন্তু তাদের মতে ধর্ম মানুষের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি সত্তার আওতায় তাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। সামগ্রিক জীবন ও ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অতপর এসব ব্যাপার পরিচালনার জন্যে প্রাকৃতিক জগতের বাইরে কোন নির্দেশের প্রতীক্ষা করার প্রয়োজনটাই বা কি। গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা থেকে যে নৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং অগ্রসর হয়ে ইংলিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য দেশে পরিব্যপ্ত হয়েছিল (American Ethical Union) তার বুনিয়াদি উদ্দেশ্যের তালিকায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল ঃ

"মানব জীবনের যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে—তা ব্যক্তিগত, সামগ্রিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়েরই হোক না কেন—ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অতিপ্রাকৃত ধারণাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে নৈতিকার অপরিসীম গুরুত্বের ওপর জোর দিতে হবে।"

এ আন্দোলনের প্রভাবাধীনে বৃটেনে Union of Ethical Societies প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে একে Ethical Union-এর সংগে মিলিয়ে দেয়া হয়। এর বুনিয়াদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল ঃ

"মানব সেবা এবং মানুষের সংগে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে এমন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া, যা এ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, প্রথমত, ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সৎপ্রীতি, দ্বিতীয় নৈতিক ধারণা ও নৈতিক জীবনের জন্যে দুনিয়ার তাৎপর্য এবং মৃত্যুপারের জীবন সম্পর্কে কোন আকীদা-বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই এবং তৃতীয়ত, নিছক মানবিক ও প্রাকৃতিক উপায়-উপাদানের

মাধ্যমে মানুষকে জীবনের যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যপ্রীতি, সত্যকে জানা এবং সত্যের জন্যে কাজ করে যাবার মতো করে তৈরী করা।"

এ শব্দগুলোর মাধ্যমে বর্তমান জগতের চিন্তা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ব্যাপারে নেতৃত্বদানকারী মানব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার ব্যবস্থাকে কার্যত যারা পরিচালিত করছে, উপরের মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে পেশকৃত ধারণা তাদের সবার মানসজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তারা সবাই কার্যত তাদের নৈতিকতাকে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং ধর্মের নৈতিক নেতৃত্ব থেকে স্বাধীন করে নিয়েছে। এখন আমাদেরকে এ ধর্মহীন নৈতিক দর্শনের অবস্থা ভালো-মন্দ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

নৈতিক দর্শনের প্রথম মৌলিক প্রশ্ন হলো এই যে, আসল এবং চরম সৎ কি, যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানুষের চেষ্টা ও কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং যার মানদন্ডে মানুষের কার্যধারা যাচাই করে তার ভালো-মন্দ অথবা ভুল-নির্ভুলের ফয়সালা করা যায় ?

এ প্রশ্নের কোন একটি মাত্র জবাব মানুষ দিতে পারেনি। এর বিভিন্ন জবাব পাওয়া গেছে। একদল আনন্দকে সেই সৎ বলে চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয় দলের মতে তাহলো পূর্ণতা। তৃতীয় দল বলেন, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য।

আবার আনন্দ সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। যেমন কোন্ ধরনের আনন্দ ? দৈহিক কামনা এবং ইন্দ্রীয় লালসা পূর্ণ করার পর যে আনন্দ লাভ হয়, তাই কি ? অথবা মানসিক উন্নতির পর্যায় অতিক্রম করার পর যে আনন্দ লাভ হয়, তাই ? অথবা নিজের ব্যক্তিত্বকে শিল্প অথবা আধ্যাত্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সুসজ্জিত করার পর যে আনন্দ লাভ হয় ? এ ছাড়াও প্রশ্ন হয়, কার আনন্দ ? প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের আনন্দ ? অথবা সেই দলের আনন্দ, যার সংগে মানুষ সম্পর্কযুক্ত ? অথবা সমগ্র মানবজাতির আনন্দ ? অথবা অন্যের আনন্দ ?

এভাবে পূর্ণতাকে চরম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করলেও বিভিন্ন প্রশ্নের উৎপত্তি হয়। যেমন, পূর্ণতার ধারণা এবং তার মানদন্ড কি ? পূর্ণতা কার চরম লক্ষ্য ঃ ব্যক্তির ? দলের ? মানবজাতির ? কার ?

অনুরূপভাবে যারা কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের ধারক এবং একটি শর্তহীন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিধানের (Categorical Imperative) শর্তহীন আনুগত্যকেই শেষ এবং চূড়ান্ত সৎ বলে গণ্য করে, তাদের ব্যাপারেও প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ বিধানটির আসল রূপ কি ? কে সেটা প্রণয়ন করলো ? কার বিধান হবার কারণেই তা অবশ্য পালনীয় হয়েছে ?

বিভিন্ন দল এ প্রশ্নগুলোর বিভিন্ন জবাব দিয়ে থাকে। দর্শন পুস্তকের পাতায়ই শুধু এরা বিভিন্ন নয়, বাস্তব জীবনেও এদের চেহারায় বিভিন্নতা ফুটে

উঠেছে। এক বিরাট ভীড়ের মতো যে মানব সমষ্টি দেখা যাচ্ছে, যারা সবাই মিলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালক উজির, সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালনাকারী সেনাপতি, মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারে মীমাংসাকারী জজ, মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নকারী আইন প্রণেতা, মানুষকে শিক্ষাদানকারী শিক্ষক, অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী, সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিচালনাগারে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী। এদের নিকট সৎ-এর কোন একটি মাত্র মানদন্ড নেই। বরং এরা সবাই—প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক মানদন্ডের অধিকারী। একই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আওতায় কাজ করেও এরা প্রত্যেকেই ভিন্নতর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। কেউ আনন্দকেই চরম লক্ষ্য মনে করে এবং আনন্দ বলতে সে মনে করে তার দৈহিক কামনা ও ইন্দ্রীয় লালসার পরিতৃপ্তি। কেউ আনন্দের পেছনে ছুটে ফিরছে, তবে আনন্দ সম্পর্কে তার ধারণা আবার অন্য রকম। তার ব্যক্তিগত আনন্দ লাভ অথবা তাথেকে বঞ্চিত হবার পরিপ্রেক্ষিতেই সে সমাজ জীবনে তার জন্যে সৎ ও অসৎ কাজের ফয়সালা করে। তার ভদ্রজনোচিত চেহারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। আমরা মনে করি যে, সে মানব সমাজের একজন সুযোগ্য উজির, জজ, শিক্ষক অথবা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন হবার কারণে সভ্যতা-যন্ত্রের একটি মূল্যবান অংশবিশেষ। অনুরূপভাবে, আনন্দ অর্থে অনেকেই শুধু মানবজাতির যে বিশেষ অংশের সংগে তারা সম্পর্কযুক্ত তার আনন্দ ও সমৃদ্ধি মনে করে। তাদের মতে এটিই একমাত্র সৎ এবং এটি হাসিল করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোই হলো পুণ্যের কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নিজের জাতি অথবা শ্রেণী ছাড়া অন্য সবার জন্যে সে সাপ এবং বিচ্ছুর রূপ ধারণ করে। কিন্তু তার ভদ্রজনোচিত চেহারার দরুন আমরা তাকে ভদ্রলোক বলেই মনে করি। আবার পূর্ণতাকে একমাত্র সৎ বলে যারা মনে করে এবং যারা কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের ধারক তাদের মধ্যেও এ ধরনের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশের আদর্শ ও মতবাদ বাস্তব ফলাফলের দিক দিয়ে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে বিষময়। কিন্তু তারা সেগুলোর ওপর 'মৃতসঞ্জীবনীর' লেবেল লাগিয়ে আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেগুলোকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক। নৈতিকতা দর্শনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হলো এই যে, আমাদের নিকট ভাল মন্দ, সৎ-অসৎ সম্পর্কে অবগত হবার কি মাধ্যম আছে ? ভাল কি আর মন্দ কি, ভুল কি আর নির্ভুল কি—একথা জানবার জন্যে আমরা কোন্ উৎসের দিকে অগ্রসর হবো ?

এ প্রশ্নের কোন একটি মাত্র জবাব মানুষ পায়নি। এর জবাবও বিভিন্ন। কারুর মতে সে মাধ্যম ও উৎস হলো মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কেউ বলেন,

জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। কেউ বলেন, জ্ঞান শক্তি। কেউ বলেন, বিবেক-বুদ্ধি। এখানে এসে বিশৃংখলা চরমে পৌছে, যা প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব জিনিসকে উৎস ও মূল গণ্য করার পর নৈতিকতার স্থায়ী নীতি এই স্বীকৃত হয় যে, তার কোন নির্দিষ্ট মানদন্ডই নেই বরং প্রবহমান ধাতুর মতোই সে গতিশীল এবং বিভিন্ন আকৃতি ও পরিমাপের ছাঁচে সে নিজেকে ঢালাই করে থাকে।

মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভের জন্যে অবশ্যি সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য একত্রিত হওয়া এবং একটি সর্বদ্রষ্টা ও পূর্ণ ভারসাম্যের অধিকারী মস্তিষ্কের তা থেকে ফলাফল লাভের প্রয়োজন। কিন্তু এ দু'টো জিনিসই অলভ্য। প্রথমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি বরং জারি আছে। তদুপরি আবার এতদিনকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতারও বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লোকের সামনে রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী তাথেকে ফলাফল লাভ করছে। তাহলে কি ঐ ক্রটিপূর্ণ তথ্যাবলী থেকে বিভিন্ন অসম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে ফলাফল লাভ করবে, তা সব নির্ভুল হতে পারে ? যদি না হয়, তাহলে নিজের ভাল-মন্দ জানার জন্যে যে মস্তিষ্ক ও মানসিকতা ঐ জ্ঞানের মাধ্যমকে যথেষ্ট মনে করে, তার রুগ্নতা কী ভীষণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তা চিন্তা করার মতো।

জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থার ব্যাপারটিও অনুরূপ। হয় আপনি নৈতিক ভালো-মন্দ জানবার জন্যে সেই সময়ের অপেক্ষা করুন যখন ঐ বিধান ও অবস্থার সন্তোষজনক পরিমাণ জ্ঞান আপনি হাসিল করতে পারবেন, নয়তো অকিঞ্চিত তথ্যাবলীকে অকিঞ্চিত জেনে এরি ভিত্তিতে বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন ও বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞানী লোকেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফয়সালা করতে থাকবেন যে, তাদের জন্যে ভাল কি এবং মন্দ কি ? নতুন পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করার তারা ঐ ফয়সালাগুলো পরিবর্তন করতেও থাকবেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আজকের ভাল আগামীকাল মন্দে পরিণত হবে এবং আজকের মন্দ আগামীকাল ভাল বলে গণ্য হবে।

জ্ঞান-শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারটিও এথেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। অবশ্যি ভাল-মন্দকে জানবার কিছুটা ক্ষমতা বুদ্ধির আছে, এতে সন্দেহ নেই। এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ বুদ্ধির কিছু না কিছু অংশও আছে। আবার জ্ঞান শক্তির সাহায্যেও ভাল-মন্দ কিছুটা জানা যায় বৈকি এবং স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মানুষের বিবেকেই ইহা অনুরণন হয়। কিন্তু এই জ্ঞানের জন্যে এদের মধ্যে কোন একটি সূত্রও তার স্বকীয়তায় যথেষ্ট নয়—যার ফলে তাকেই শেষ এবং একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। বুদ্ধি অথবা জ্ঞান যাকেই আপনি যথেষ্ট মনে করুন না কেন অবশ্যি জ্ঞানের এমন একটি মাধ্যমের ওপর আপনি আস্থাশীল হবেনই যার মধ্যে শুধু স্বভাবজাত অসম্পূর্ণতা

ও সীমাবদ্ধতাই নয় বরং বিভিন্ন ব্যক্তি, শ্রেণী, অবস্থা ও কালে উপনীত হয়ে সে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে ভাল ও মন্দ বলে গণ্য করবেই।

এই যেসব বিশৃংখলার কথা আমি উল্লেখ করলাম এগুলো নিছক তথ্যমূলক প্রবন্ধ ও দার্শনিক আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই বরং দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে কার্যত এগুলোর সুস্পষ্ট প্রতিফলন হচ্ছে। আপনার নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও যে সমস্ত লোক কর্মরত আছেন—তারা কর্তা বা কর্মীর আসনে সমাসীন থাকুন অথবা কর্তা ও কর্মী তৈরীর কাজে লিপ্ত থাকুন—তারা সবাই ভাল ও মন্দ এবং ভুল ও নির্ভুলকে জানবার জন্যে নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী ঐসব বিভিন্ন উৎসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক দলের ভাল-মন্দ অন্যের ভাল-মন্দ থেকে পৃথক। এমনকি একজনের ভালো অন্যের জন্য চরম মন্দ এবং একজনের মন্দ অন্যের জন্যে চরম ভালয় পরিণত হয়েছে। এই বিশৃংখলা নৈতিকতার কোন স্থায়ী ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি। দুনিয়ার যেসব জিনিসকে হামেশা অপরাধ ও গুনাহ্ মনে করা হয়েছে আজ কোন না কোন দলের দৃষ্টিতে সেগুলো মূর্তিমান ভাল অথবা প্রত্যক্ষ ভাল না হলেও পরোক্ষ ভালয় পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব সৎগুণাবলীকে মানুষ ভাল মনে করে এসেছে তাদের অধিকাংশই আজ নির্বুদ্ধিতা এবং হাস্যাস্পদ বলে গণ্য হয়েছে এবং বিভিন্ন দল লজ্জার সাথে নয়, সগর্বে প্রকাশ্যে এগুলোকে নেস্তনাবুদ করছে। আগের যুগে মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলতো কিন্তু সত্যকেই নৈতিকতার মানদন্ড বলে স্বীকার করতো। কিন্তু আজকের যুগের দর্শন মিথ্যাকে ভাল ও সৎ বানিয়ে দিয়েছে। আজ মিথ্যা বলার জন্যে একটি স্থায়ী শিল্প সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র ব্যাপক হারে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে। দিকে দিকে তার বীজ ছড়িয়ে ফিরছে। প্রত্যেক অসৎ গুণের অবস্থাও অনুরূপ। পূর্বে অসৎগুণাবলী অসৎই ছিল কিন্তু আজ নতুন দার্শনিক মতবাদের বদৌলতে এগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সৎ ও ভালয় পরিবর্তিত হয়েছে।

নৈতিকতা দর্শনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, নৈতিক সংবিধানের পেছনে কোন্ শক্তি সক্রিয় রয়েছে যার জোরে এ সংবিধান প্রবর্তিত হয়? এর জবাবে আনন্দ ও পূর্ণতার প্রসাদভোগীরা বলেন যে, যেসব সৎগুণ আনন্দ ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের আনুগত্য করার শক্তি তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে রাখে এবং যেসব অসৎগুণ দুঃখ-কষ্ট অবনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তারাও নিজেদের শক্তির জোরেই তাদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। এছাড়া নৈতিক সংবিধানের জন্যে বাইরের কোন কর্তৃত্বের প্রয়োজনই নেই। দ্বিতীয় দল বলেন, কর্তব্য বিধান হলো মানুষের সুসংগত ইচ্ছা শক্তি কর্তৃক নিজের সংস্থাপিত বিধান। এর জন্যে কোন বহিঃশক্তির প্রয়োজন নেই। তৃতীয় দল রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নৈতিক বিধানের

আসল প্রবর্তক শক্তি মনে করেন। এ মতের প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্যে পূর্বে যেসব ক্ষমতা নির্ধারিত ছিল—অর্থাৎ দেশবাসীদের কি করা উচিত এবং কি না করা উচিত এর ফয়সালা করা—তা সবই রাষ্ট্রের দিকে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থ দল রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমাজকে এ মর্যাদা দিয়েছে। এ জবাবগুলো কার্যত দুনিয়ায় অগণিত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। প্রথম জবাব দু'টো ব্যক্তিগত জুলুম, হঠধর্মিতা ও বিপথগামিতা এত বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বসেছে। অতপর এর প্রতিক্রিয়া অন্য দার্শনিক মতবাদের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এ মতবাদগুলো রাষ্ট্রকে খোদা বানিয়ে ব্যক্তিকে পূর্ণতাতরে বান্দায় পরিণত করেছে অথবা ব্যক্তির ভাত-রুটির সংগে সংগে তার ভালো-মন্দ, সৎ ও অসতের লাগামও তুলে দিয়েছে সমাজের হাতে। অথচ রাষ্ট্র বা সমাজ এ দু'টো কোনটাই নিষ্কলুষ ও মহাপবিত্র নয়।

ঠিক একই ব্যাপার দেখা দেয় এ প্রশ্নের ক্ষেত্রেও যে, কোন্ প্রেরণা মানুষকে তার স্বভাবজাত খাহেশের বিরুদ্ধে নৈতিক নির্দেশাবলীর অনুগত করে ? কারুর মতে কেবল আনন্দ-লিপসা ও দুঃখ-কষ্টের ভয়ই এর জন্যে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। কেউ নিছক পূর্ণতার আকাংখা এবং অপূর্ণতা থেকে বাঁচবার কামনাকে এর জন্যে যথেষ্ট মনে করেন। কেউ এ জন্যে নিছক আইনের প্রতি মানুষের ঐচ্ছিক সম্মানবোধের ওপর আস্থা রাখেন। কেউ রাষ্ট্রের পুরস্কারের আশা এবং তার রোষাণলের ভয়কে গুরুত্ব দেন। কেউ সমাজের পুরস্কার এবং তার ক্রোধকে ভীত ও লালসার জন্যে ব্যবহার করার ওপর জোর দেন। এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি জবাবই কার্যত আমাদের নৈতিক ব্যবস্থার মধ্য থেকে কোন না কোনটির মধ্যে অগ্রবর্তীর আসন দখল করেছে। সামান্য অনুসন্ধান করলে সহজেই এ সত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয় যে, এ প্রেরণাদায়ক শক্তিগুলো সৎকর্মেরও যতটা সুষ্ঠু প্রেরণা যোগায়, অসৎকর্মেরও ঠিক ততটা সুষ্ঠু প্রেরণা যোগাতে পারে। বরং অসৎকাজের প্রেরণা যোগাবার ক্ষমতা এদের মধ্যে অনেক বেশী আছে। বলা বাহুল্য কোন উন্নত পর্যায়ের নৈতিকতার জন্যে এ প্রেরণাদায়ক শক্তিগুলো একেবারেই অকিঞ্চিত।

দুনিয়ার বর্তমান নৈতিক অবস্থার এই যে পর্যালোচনাটুকু আমি করলাম এ থেকে প্রথম দৃষ্টিতেই একথা অনুভূত হবে যে, বর্তমান দুনিয়া একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নৈরাশ্যের মধ্যে অবস্থান করছে। আল্লাহ থেকে বেনিয়াজ হয়ে মানুষ নিশ্চিন্তে তার নৈতিক পুনর্গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যে কোন বুনিয়াদ হাসিল করতে পারেনি। নৈতিকতার যাবতীয় মৌলিক প্রশ্নাবলীর আসলে কোন সদুত্তর তার কাছে নেই। যে শ্রেষ্ঠতম সততার প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায়ে পরিণত হতে পারে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে ভাল বা মন্দ এবং ভুল বা নির্ভুল কাজের ফয়সালা করা যেতে পারে তার কোন সন্ধান সে লাভ করতে পারেনি। ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসৎ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার জন্যে কোন উৎসের সন্ধানও সে

পায়নি। যে কর্তৃত্বের বলে নৈতিকতার কোন উন্নত ও সার্বজনীন বিধান প্রবর্তন করার শক্তি লাভ করা যায় তা হাসিল করতেও সে সক্ষম হয়নি এবং এমন কোন প্রেরণাদায়ক শক্তিও সে লাভ করতে পারেনি যা মানুষকে সত্য পথে চলার এবং অসত্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সত্যিকারভাবে প্রলুব্ধ করে। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষ হঠধর্মিতার সংগে ঐ প্রশ্নগুলো সমাধন করতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মতানুযায়ী সমাধান তারা করেছেও কিন্তু এই সমাধানের পরিণাম ফলই আজ আমরা দুনিয়ার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত দেখছি—যা নৈতিক পতনের ভয়াবহ তুফান রূপে অগ্রসর হয়ে সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের বাণী শোনাচ্ছে।

মানুষের নৈতিক বৃত্তির নির্ভুল সংগঠনের জন্যে বুনিয়াদ তালাশ করার সময় কি এখনো সমুপস্থিত হয়নি ? আসলে এ তালাশ ও অনুসন্ধান নিছক একটি পুঁথিগত আলোচনা নয় বরং এটি আমাদের জীবনের একটি বাস্তব প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির নাজুকতা একে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে পরিণত করেছে। এ প্রেক্ষিতে আমি নিজের অনুসন্ধানের ফলাফল পেশ করছি। আমি চাই যেসব লোক এ প্রয়োজনের অনুভূতি রাখেন তারা শুধু আমার এ ফলাফলের ওপর ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করেই ক্ষান্ত হবেন না বরং মানুষের নৈতিক বৃত্তির নির্ভুল বুনিয়াদ কি হতে পারে এ সম্পর্কে তারা নিজেরাও চিন্তা করবেন।

আমি অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তাহলো এই যে, নৈতিকতার জন্যে স্রেফ একটি বুনিয়াদই নির্ভুল এবং ইসলাম সে বুনিয়াদটি সরবরাহ করে। নৈতিকতার দর্শনের সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব আমরা এখানে পাই। এমন জবাব পাই যার মধ্যে দার্শনিক জবাবসমূহের দুর্বলতাগুলোর অস্তিত্ব নেই। ধর্মীয় নৈতিকতার যেসব দুর্বলতার ফলে সে কোন শক্তিশালী চরিত্র গঠন করতে পারে না এবং মানুষকে তমদ্দুনের ব্যাপকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যও করে না তার ছিটেফোঁটাও এখানে নেই। এখানে আমরা এমন একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নেতৃত্ব লাভ করি যা আমাদেরকে জীবনের সমস্ত বিভাগে উন্নতির চরমতম পর্যায়ে উপনীত করতে পারে। এখানে আমরা এমন নৈতিক বিধান লাভ করি যার ওপর একটি সৎ ও সর্বোত্তম তমুদ্দুনিক ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে এবং এ বিধানের ওপর ব্যক্তি ও সমাজ চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করলে মানব জীবন বর্তমানে যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তাথেকে রেহাই পেতে পারে। কোন্ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

দর্শন যে স্থান থেকে নৈতিকতার আলোচনা শুরু করে আসলে তা নৈতিক বিষয়ের প্রারম্ভিক বিন্দু নয় বরং মাঝখানের কতিপয় বিন্দু। প্রারম্ভিক বিন্দুকে

ছেড়ে এখান থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এটিই হলো প্রথম ভুল। মানুষের কর্মকান্ডের ভুল ও নির্ভুলের মানদন্ড কি এবং কোন্ সৎগুণাবলী পর্যন্ত পৌছবার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো মানুষের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—এ প্রশ্নগুলো আসলে পরের পর্যায়ের। এর আগের আসল প্রশ্নটি এই হওয়া উচিত যে, এ জগতে মানুষ কোন্ মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত ? অন্যান্য প্রশ্নগুলো থেকে এ প্রশ্নটির অগ্রবর্তী হবার কারণ আছে। মর্যাদার স্থান নির্দেশ ছাড়া নৈতিকতার প্রশ্ন শুধু অনর্থকই নয় বরং এতে খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে যে, এভাবে যে নৈতিক বিধান নির্ধারিত হবে তা মূলতই হবে ক্রটিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন সম্পত্তি সম্পর্কে আপনাকে ফয়সালা করতে হবে যে, তার মধ্যে কিভাবে আপনার কাজ করা উচিত, তাকে কিভাবে ব্যবহার করার অধিকার আপনার আছে আর কিভাবে ব্যবহার করার অধিকার আপনার নেই। এ সম্পত্তির ব্যাপারে আপনি কোন্ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং এর সংগে আপনার সম্পর্ক কোন্ ধরনের, এ বিষয়টি নির্ধারিত না করেই কি আপনি এ প্রশ্নের নির্ভুল মীমাংসা করতে পারেন ? যদি এ সম্পত্তির মালিক অন্য কেউ হয় এবং আপনি এতে আমানতদার ও রক্ষকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে এতে আপনার নৈতিক কর্মপদ্ধতি অনেকটা অন্য ধরনের হবে। আর যদি আপনি নিজেই এর মালিক হন এবং এর ওপর আপনার সীমাহীন মালিকানা ক্ষমতা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার নৈতিক কর্মপদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মর্যাদার প্রশ্ন নৈতিক কর্মপদ্ধতির ধরন হিসেবে চূড়ান্ত হবে—ব্যাপার শুধু এতটুকু নয় বরং আসলে এ বিষয়ের ফয়সালা এরই ওপর নির্ভর করবে যে, এ সম্পত্তিতে কে আপনার জন্যে নির্ভুল কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার অধিকার রাখে, আপনি নিজে অথবা আপনি যার আমানতদার সে ?

ইসলাম সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের দিকে মনসংযোগ করে এবং সকল দ্বিধা সন্দেহের উর্ধে থেকে সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে বাতলিয়ে দেয় যে, এ দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর সহকারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখানে যত সব জিনিসের সংগে মানুষের সম্পর্ক সমস্তর-ই মালিক আল্লাহ্ এমনকি মানুষের নিজের দেহ এবং তার এ দেহের মধ্যে যত শক্তি আছে কোন কিছুরই মালিক সে নিজে নয়। আল্লাহ্-ই এ সবের মালিক। আল্লাহ্ তাকে এসব জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে নিজের সহকারী হিসেবে এখানে নিযুক্ত করেছেন এবং এ নিযুক্তির মধ্যে রয়েছে তার পরীক্ষা। পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল এ দুনিয়ায় প্রকাশ হবে না বরং যখন ব্যক্তি, জাতি তথা সমগ্র মানবজাতির কাজ খতম হয়ে যাবে এবং মানুষের প্রচেষ্টার প্রভাব ও ফলাফল পূর্ণতার সীমায় পৌছে যাবে, তখনই আল্লাহ একই সময়ে সবার হিসেব নেবেন এবং এ বিষয়ের ফয়সালা করবেন যে, কে তাঁর বন্দেগী ও সহকারীত্বের হক সঠিকভাবে আদায় করেছে এবং কে আদায় করেনি। এ পরীক্ষা শুধু কোন একটি ব্যাপারেই নয় বরং সমস্ত ব্যাপারেই, জীবনের শুধু একটি বিভাগেই নয় বরং সামগ্রিক-

ভাবে, সমগ্র জীবনব্যাপী। দেহ ও আত্মার যত রকমের শক্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে, সবার জন্যে এ পরীক্ষা এবং বাইরে যেসব জিনিসের ওপর যে ধরনের ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে—কিভাবে সে এগুলোর ওপর নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছে দেখার জন্যে।

মর্যাদা নির্ধারণের স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়ায় নিজের জন্যে নৈতিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের অধিকার মানুষের আর থাকে না বরং এ ফয়সালা করা আল্লাহর অধিকারে পরিণত হয়। অতপর দার্শনিকগণ নৈতিকতা দর্শনের যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সবগুলোরই সমাধান হয়ে যায়। আর শুধু সমাধানই নয় বরং এরপর এক-একটি প্রশ্নের ছত্রিশটি জবাবের এবং এক-একটি জবাবের ভিত্তিতে মানুষের এক-একটি দলের নৈতিকতার এক ভিন্নতর দিকে পরিচালিত হবার এবং একই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের আওতায় বাস করেও এ বিভিন্ন দিকে পরিচালিত লোকদের নিজেদের বিপথগামিতার মাধ্যমে বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার আর কোন মওকাই থাকে না। ইসলাম মানুষের যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছে, তা যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে একথা আপনা আপনি নির্ধারিত হয়ে যায় যে, আল্লাহর পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করাই হলো সে উন্নততর ভাল ও সৎ, যাকে হাসিল করা প্রত্যেক মানুষের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এবং কোন্ পদ্ধতি এ সৎ হাসিল করার পক্ষে কতটুকু সহায়ক বা প্রতিবন্ধক—সে কথার ওপর তার ভুল বা নির্ভুল হওয়া নির্ভর করে। অনুরূপভাবে এখান থেকে একথাও নির্ধারিত হয়ে যায় যে, মানুষের জন্যে ভালো-মন্দ ও ভুল-নির্ভুলকে জানার আসল উৎস হলো আল্লাহর হেদায়াত এবং এছাড়া জ্ঞান লাভের অন্যান্য মাধ্যম এ আসল উৎসের সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু আসল উৎস হতে পারে না। এছাড়া একথাও স্থিরীকৃত হয়ে যায় যে, নৈতিক বিধান অবশ্য পালনীয় হবার আসল বুনিয়াদ হলো শুধু এই যে, এ বিধান আল্লাহ্ প্রবর্তিত। এবং এই সংগে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সচ্চারিত্রিক গুণাবলীর আনুগত্য করা এবং অসচ্চারিত্রিক গুণাবলীকে এড়িয়ে যাবার জন্যে আসল প্রেরণাদায়ক শক্তি আল্লাহ্ প্রেম, তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান এবং তাঁর বিরাগভাজনের আশংকা হওয়া উচিত।

অতপর এথেকে শুধু নৈতিকতা দর্শনের সমস্ত নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসাই হয়ে যায় না বরং এর ভিত্তিতে যে নৈতিক পদ্ধতি গড়ে উঠে তার মধ্যে চরম ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসংগত পদ্ধতিতে সেসব নৈতিক পদ্ধতি নিজেদের উপযোগী স্থান লাভ করে, যা নৈতিকতা দর্শনের চিন্তাবিদগণ করেছেন। দর্শন ভিত্তিক নৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সত্যের কোন অংশ নেই, এটিই এর আসল ত্রুটি নয় বরং এর আসল ত্রুটি হলো এই যে, এরা সত্যের একটা অংশ গ্রহণ করে তাকে পূর্ণ সত্য বানিয়ে নিয়েছে। অংশকে পূর্ণ বস্তু বানাবার জন্যে যত পরিমাণ

অতিরিক্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তার পূর্ণতার জন্যে অবশ্যি এদেরকে বাতিলের অনেক অংশ গ্রহণ করতে হয়। এর বিপরীত পক্ষে ইসলাম পূর্ণ সত্য পেশ করে এবং মানুষের কাছে যেসব আংশিক সত্য পৃথক পৃথকভাবে এবং অপূর্ণ অবস্থায় ছিল তা সব এ পূর্ণ সত্যের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়।

এখানে আনন্দেরও একটা স্থান আছে, কিন্তু তাহলো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ফলে সৃষ্ট আনন্দ ও সমৃদ্ধি। এ আনন্দ ও সমৃদ্ধি শারীরিক ও বস্তু ভিত্তিক, মানসিক ও আর্থিক এবং শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক সব রকমের। উপরন্তু এ আনন্দ ও সমৃদ্ধি ব্যক্তি, দল এবং সমগ্র মানব জাতিরও। এ বিভিন্ন আনন্দের মধ্যে সংঘর্ষ নেই বরং সংযোগ আছে।

এখানে পূর্ণতারও একটা স্থান আছে, কিন্তু সে পূর্ণতা আল্লাহর পরীক্ষায় শতকরা একশো নম্বর লাভ করার অধিকারী। এবং এ পূর্ণতা শুধু ব্যক্তির নয় বরং দলের, জাতির এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের। নির্ভুল নৈতিক কর্মপদ্ধতির পরিচয় হলো এই যে, এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি নিজেই পূর্ণতার দিকে অগ্রগমন করে না বরং সে অন্যের পূর্ণতার সহায়কও হয় এবং কেউ কারুর পূর্ণতা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

এখানে ক্যান্টের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিধানও (Categorical Imperative) পূর্ণ মর্যাদা সহকারে স্থান লাভ করে। এবং যে নোংগর লাভ না করার দরুন দর্শনের দরিয়ায় এ জাহাজ দোদুল্যমান ছিল তাও সে লাভ করে। ক্যান্ট যে অবশ্য পালনীয় বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যার কোন ব্যাখ্যা তিনি নিজে করতে পারেননি আসলে তাহলো আল্লাহর বিধান। আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার রূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান হবার কারণেই তা অবশ্য পালনীয় এবং বিনা দ্বিধায় এরই আনুগত্য করার নাম হলো নেকী।

অনুরূপভাবে এখানে নৈতিক ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভের জন্যে যে উৎসের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তা দার্শনিকগণ কথিত জ্ঞানলাভের অন্যান্য মাধ্যমকে অস্বীকার করে না বরং ওগুলোকে একটি পদ্ধতির অংশীভূত করে। অবশ্যি যে জিনিসটাকে অস্বীকার করে তাহলো শুধু এই যে, ওগুলোকে অথবা ওদের মধ্য থেকে কোন একটিকে জ্ঞানলাভের আসল ও শেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহর হেদায়াতের মাধ্যমে ভাল-মন্দ যে জ্ঞান আমাদের দান করা হয়েছে তাহলো আসল জ্ঞান। এছাড়া অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, জীবন বিধান ও অস্তিত্বের অবস্থা লব্ধ জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান এ সবই ঐ আসল জ্ঞানের সাক্ষ্যস্থল। আল্লাহর হেদায়াত যে জিনিসগুলোকে ভাল ও সৎ বলে মানুষের অভিজ্ঞতা তার ভাল ও সৎ হবার সাক্ষ্য দেয়, জীবন বিধান তার সত্যতা প্রমাণ করে। বিবেক, বুদ্ধি উভয়ই তার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু সত্যতার মানদন্ড হলো একমাত্র আল্লাহর হেদায়াত, জ্ঞানের এসব মাধ্যমগুলো নয়। মানবজাতির ইতিহাস লব্ধ অভিজ্ঞতা অথবা জীবন বিধান থেকে যদি এমন কিছু প্রমাণ করা

হয় অথবা জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এমন কোন রায় কায়েম করা যায় যা আল্লাহর হেদায়াত বিরোধী তাহলে আল্লাহর হেদায়াতকেই প্রকৃত স্বীকৃতি দেয়া হবে, ঐ প্রমাণ অথবা রায়কে নয়। আমাদের নিকট জ্ঞানের একটা সনদযুক্ত মানদন্ড থাকায় এই লাভ হয় যে, আমাদের জ্ঞান রাজ্যে শৃংখলা কায়েম থাকে এবং সে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য থেকেও আমরা নিষ্কৃতি লাভ করি যা কোন মানদন্ড না থাকায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের নিজের রায় পেশ করার কারণে সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে এখানে নৈতিক বিধানের শক্তি-সহায়ক (Sanction) ও প্রেরণা সৃষ্টিকারীর সমস্যাও এভাবে সমাধান করা হয় যে, এর ফলে দার্শনিকগণ যেসব জিনিসের কথা বলেছেন তা অস্বীকার করা হয় না। বরং সেগুলোর সংশোধন হয়ে যায় এবং যেসব ভুল পরিসরে সেগুলোকে সম্প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই সম্প্রসারিত হয়েছে সেখান থেকে সরিয়ে তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে সঠিক স্থানে রাখা হয়। আল্লাহর বিধান নিজেকে আল্লাহর বিধান হবার কারণেই প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি রাখে। এ শক্তি সেই মু'মিনের মধ্যেও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার মধ্যে আনন্দ অনুভব করে এবং যে সেই পূর্ণতা অনুসন্ধান করে ফিরছে যা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবার পর লাভ করা যায়। এছাড়াও এ শক্তি মু'মিন সমাজ এবং আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সৎ রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে। আইনের আনুগত্য করার জন্যে মু'মিনকে উৎসাহদান করে তার নির্ভেজাল কর্তব্যজ্ঞান, তার সত্যকে সত্য জেনে তাকে পছন্দ করার ক্ষমতা, বাতিলকে বাতিল জেনে তাকে ঘৃণা করার ক্ষমতা এবং তার আল্লাহপ্রীতি।

এভাবে মানুষকে আল্লাহর কর্তৃত্বের বাইরে ধারণা করে নিয়ে তার জন্যে একটি নৈতিক ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করার প্রচেষ্টা চালানোর ফলে মানুষের চিন্তা ও কর্মজগতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় ইসলাম তাকে পুরোপুরি খতম করে দেয়। অতপর আলোচনাটাকে আর একটু এগিয়ে নেয়া যাক। ইসলাম আল্লাহর যে ধারণা পেশ করে তাহলো এই যে, মানুষ ও সমগ্র বিশ্বজাহানের একমাত্র মালিক, স্রষ্টা, মাবুদ ও শাসক হলেন আল্লাহ। এ খোদায়ীর কাজে কেউ তাঁর শরীক নেই। তাঁর নিকট নেক দোয়া ছাড়া অন্য এমন কোন সুপারিশের স্থান সংকুলান নেই যা জোর করে মানিয়ে নেয়া অথবা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। তাঁর নিকট প্রত্যেক ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে তার নিজের কার্যাবলীর ওপর। সেখানে কেউ কারুর গুনাহর কাফ্ফারা হতে পারে না, একজনের কাজের জন্যে অন্যজনকে দায়ী করা হয় না, একজনের কাজের ফল অন্যজন পায় না। তাঁর নিকট পক্ষপাতিত্ব নেই। কোন একটি খান্দান, জাতি অথবা বংশের ব্যাপারে তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশী আগ্রহশীল নন। তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। সবার জন্যে একই নৈতিক বিধান রয়েছে এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে একজনের ওপর অন্যজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন

হয়। তিনি নিজে রহীম এবং রমহ্ পছন্দ করেন। তিনি নিজে দাতা এবং দানশীলতা পছন্দ করেন। তিনি নিজে ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। তিনি নিজে ইনসাফকারী এবং ইনসাফ পছন্দ করেন। তিনি নিজে জুলুম, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী, সংকীর্ণ মনোভাব, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ এবং স্বার্থদুষ্ট পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত। এজন্যে তাদেরকেই পছন্দ করেন যারা এসব অসৎগুণাবলী মুক্ত। আবার শ্রেষ্ঠত্বে একমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে তাই তিনি অহঙ্কার পছন্দ করেন না। উলুহিয়াত একমাত্র তাঁরই জন্যে আর সবাই তাঁর বান্দা। এজন্যে এক বান্দার ওপর অন্য বান্দার খোদায়ী তিনি পছন্দ করেন না। তিনি একই মালিক এবং অন্যের কাছে যা কিছু আছে সব তাঁর আমানত হিসেবে রক্ষিত হয়েছে। এ জন্যে কোন বান্দার স্বাধীন ক্ষমতা, কারুর অন্যের জন্যে আইন প্রণয়ন এবং কারুর আনুগত্য অপরের জন্যে অবশ্য স্বীকৃত হওয়া—এসব আসলে ভুল। সবই একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করবে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর আনুগত্য করাই সবার জন্যে বেহতের। আবার তিনি উপকারীও। এবং কৃতজ্ঞতা, শুকুরগুজারী ও ভালবাসার ওপরও তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি নেয়ামত দানকারী এবং তাঁর নেয়ামতসমূহকে তাঁরই ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করার অধিকার রাখেন। তিনি ন্যায় বিচারক এবং মানুষ অবশ্যি তাঁর ন্যায় বিচারে সাজা লাভের ভয় এবং পুরস্কার লাভের লোভ করবে। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী এবং দিলের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন নিয়ত সম্পর্কেও অবগত। এজন্যে বাহ্যিক সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁকে প্রতারিত করা যেতে পারে না। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, কাজেই অপরাধ করে তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাবার আশাও কেউ করতে পারে না।

আল্লাহ সম্পর্কিত এ ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করুন। এথেকে একেবারে স্বাভাবিক ফল হিসেবে মানুষের জন্যে একটি পূর্ণাংগ নৈতিক জীবনের নকশা অস্তিত্ব লাভ করে এবং এ নকশা শিরকবাদী ধর্ম ও নাস্তিক্যবাদী ব্যবস্থার নৈতিক বিধানের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া যায় তাথেকে পুরোপুরি মুক্ত। এখানে নৈতিক দায়িত্ব থেকে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে কোথাও কোন চোরা দরজা নেই। সেসব অত্যাচার ও দুষ্ট-দর্শনের কোন স্থানও এখানে নেই—যাদের কারণে মানুষ তার নিজের ইচ্ছানুসারে মানব জগতকে বিভক্ত করে তার এক অংশের জন্যে মূর্তিমান ফেরেশতা এবং অন্য অংশের জন্যে মূর্তিমান শয়তানে পরিণত হয়। নাস্তিক্যবাদী দর্শনের সেসব মৌলিক দুর্বলতাগুলোও এর মধ্যে পাওয়া যায় না যেগুলোর কারণে নৈতিকতায় কোন প্রকার দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে পারে। এ নেতিবাচক সৎগুণাবলীর সংগে ঐ নকশার ইতিবাচক সৎগুণও রয়েছে, এবং তাহলো এই যে, এটি নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের একটি উন্নততর ও ব্যাপকতর সীমারেখা পেশ করে যার ব্যাপকতা ও উচ্চতার কোন সীমা পরিসীমা নেই এবং ঐ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে এমন সব প্রেরণাদায়ক শক্তি সংগ্রহ করে যা সর্বাধিক পবিত্র।

অতপর এ ধারণা যে, পরীক্ষা কোন একটি জিনিসের মধ্যে নয় বরং আল্লাহ মানুষকে যতো জিনিস দিয়েছেন সবের মধ্যে কোন একটি অবস্থায় নয় বরং মানুষ এখানে যত অবস্থার সম্মুখীন হয় সমস্তর মধ্যে এবং কোন একটি বিভাগে নয় বরং সমগ্র জীবনে—এটি নৈতিকতার পরিসরকে ঠিক ততটাই সম্প্রসারিত করে যতটা সম্প্রসারিত হয়ে আছে পরীক্ষার পরিসর। মানুষের বুদ্ধি, তার জ্ঞানের মাধ্যম তার মানসিক ও চিন্তার শক্তি, তার ইন্দ্রিয়, তার ভাবাবেগ, তার আশা আকাংখা, তার দৈহিক শক্তি সবই পরীক্ষায় শরীক আছে। অর্থাৎ পরীক্ষা হলো মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের। আবার বাইরের দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসের সংস্পর্শে আসে, যেসব জিনিস সে ব্যবহার করে, বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব মানুষের সে মুখোমুখি হয় তাদের সবার সাথে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে পরীক্ষা রয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা হলো এ বিষয়ের মধ্যে যে, মানুষ কি এসব কিছু আল্লাহর উলুহিয়াত এবং নিজের বান্দা ও প্রতিনিধি হবার অনুভূতির সংগে অথবা আজাদী ও স্বাধীন মনোবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে করছে ? অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের বান্দা হয়ে করছে ? নৈতিকতার এ ব্যাপকতর ধারণার মধ্যে ধর্মের সীমিত ধারণা সৃষ্টি সংকীর্ণতা নেই। এটি মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করে। প্রতি ক্ষেত্রের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের সংগে সম্পর্কযুক্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হবার জন্যে যেসব নৈতিক বিধানের আনুগত্যের প্রয়োজন হয়, তা সবই তাকে দান করে।

অতপর পরীক্ষার আসল ও চূড়ান্ত ফয়সালা এ জীবনে নয় বরং অন্য জীবনে হবে এবং আসল সাফল্য ও ব্যর্থতা এখানে নয় বরং ওখানে হবে—এ ধারণা দুনিয়ার জীবন ও তার যাবতীয় সমস্যার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টির (Out Look) মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এ ধারণার কারণেই এ দুনিয়ায় যে ফলাফল বের হয় তা আর আমাদের ভাল-মন্দ, ভুল-নির্ভুল, হক-বাতিল এবং সাফল্য-ব্যর্থতার সন্দেহাতীত, আসল ও শেষ মানদন্ড থাকে না। এজন্যে নৈতিক আইনের আনুগত্য বা অআনুগত্য এই ফলাফলের উপর নির্ভরও করতে পারে না। যে ব্যক্তি এ ধারণাটি গ্রহণ করে নেবে সে অবশ্যি নৈতিক আইনের আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকবে—তাতে এ দুনিয়ায় দৃশ্যত এর ফলাফল ভাল বা মন্দ অথবা এতে সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই হোক না কেন। এর অর্থ এই নয় যে, তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার ফলাফল হবে একেবারেই অবিবেচনা যোগ্য। বরং এর অর্থ হলো শুধু এই যে, সে আসল ও চরম বিবেচনা এর নয় —আখেরাতের চিরন্তন ফলাফল সম্পর্কে করবে এবং নিজের জন্যে শুধু সে কর্মপদ্ধতিকে নির্ভুল মনে করবে যেটা এ ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। কোন জিনিস পরিত্যাগ অথবা গ্রহণ করার ফয়সালা করার জন্যে সে দেখবে না যে, সেটি জীবনের এ প্রারম্ভিক পর্যায়ে আনন্দ, মজা ও লাভের কারণ কিনা। বরং সে দেখবে জীবনের শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত ও অনিবার্য ফলাফলের দিক দিয়ে

সেটা কেমন। এভাবে তার নৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যি উন্নয়নমুখী থাকবে কিন্তু তার নৈতিক বিধান পরিবর্তনশীল হবে না। তার চরিত্র ও বিভিন্নতা দোষে দুষ্ট হবে না। অর্থাৎ তাহজীব-তমদ্দুনের উন্নতি ও অগ্রগতির সংগে সংগে তার নৈতিক ধ্যান–ধারণার মধ্যে অবশ্যি ব্যাপকতার সৃষ্টি হবে কিন্তু এ কখনো সম্ভব হবে না যে, ঘটনার পার্শ্ব পরিবর্তন হতে থাকবে এবং গিরিগিটের রং পরিবর্তনের মতো মানুষের নৈতিক ভংগীর মধ্যেও কোন স্থায়িত্ব থাকবে না।

কাজেই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আখেরাতের এ ইসলামী ধারণা দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সুফল দান করে—যা অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যেতে পারে না। এক ঃ এর কারণে নৈতিক বিধি-বিধান ভীষণ শক্তিশালী হয়। তার দোদুল্যমান হবার কোন আশংকাই থাকে না। দুই ঃ এর কারণে মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন দৃঢ়তা অর্জন করে যে, ঈমানের শর্তে তার ভিন্নমুখী হবার কোনে আশংকা থাকে না। দুনিয়ায় সত্যতার দশটি বিভিন্ন ফলাফল বের হতে পারে এবং ঐ ফলাফলগুলোর ওপর দৃষ্টি স্থাপনকারী কোন সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি সুযোগ ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দশটি বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আখেরাতের সত্যতার ফল অবশ্যি একটি মাত্র হয় এবং এর ওপর দৃষ্টি স্থাপনকারী মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে অবশ্যি একটিমাত্র কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে। দুনিয়ার ফলাফলের কথা বিচার করলে দেখা যাবে, ভাল-মন্দ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয় বরং একই জিনিস নিজের বিভিন্ন ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কখনো ভাল আবার কখনো মন্দে পরিণত হচ্ছে এবং এর অনুপস্থিতিতে দুনিয়া-পরস্ত লোকের ভূমিকাও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আখেরাতের ফলাফলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, ভাল ও মন্দ উভয়ই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। তখন আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনের জন্যে কখনো ভালকে অশুভ পরিণতি এবং মন্দকে শুভ পরিণতি মনে করে নিজের ভূমিকা পরিবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আবার মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা এবং এখানকার যাবতীয় জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা আসলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে—এ ধারণা মানব জীবনের জন্যে পথ ও উদ্দেশ্য দু'টোই নির্ধারিত করে দেয়। এ ধারণার ফলে মানুষের জন্যে স্বাধীন ক্ষমতা, অন্যের বন্দেগী এবং খোদায়ীর শ্রেষ্ঠত্বের যাবতীয় দৃষ্টিভংগী ভুল প্রমাণিত হয় এবং স্রেফ এ একটিমাত্র দৃষ্টিভংগী তার জন্যে নির্ভুল প্রমাণিত হয় যে, নিজের যাবতীয় ব্যাপারে সে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত এবং তাঁর অবতীর্ণ নৈতিক আইনের বাধ্য থাকবে। তাছাড়া এথেকে এও প্রমাণ হয় যে, মানুষ একদিকে তার নৈতিক দৃষ্টিভংগীর ব্যাপারে এমন প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতিকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলবে যাতে স্বাধীন মনোবৃত্তি ও বিদ্রোহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর বন্দেগী অথবা উলুহিয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের সামন্যতম গন্ধও পাওয়া যায়। কেননা এ তিনটি জিনিস

তার প্রতিনিধি মর্যাদা বিরোধী। কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহর সম্পদকে কাজে লাগানো, আল্লাহর সৃষ্ট শক্তির সংগে তার ব্যবহার এবং আল্লাহর প্রজাদের ওপর তার শাসন পরিচালনা হবে সে নৈতিকতা ও ব্যবহার মোতাবিক, যা এ রাজ্যের আসল মালিক নিজের দেশ ও প্রজাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করছে। কেননা প্রতিনিধি মর্যাদার স্বাভাবিক দাবীর.তাগিদেই শাসকের প্রতিনিধির নীতি শাসকের নীতি থেকে এবং শাসকের প্রতিনিধির নৈতিকবৃত্তি শাসকের নৈতিকবৃত্তির থেকে ভিন্নতর হবে না। এছাড়াও এ ধারণা থেকে এও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যেসব শক্তি দান করেছেন এবং দুনিয়ায় তাকে যেসব উপায়-উপকরণ দিয়েছেন, সেসব ব্যবহার করার এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করার জন্যেই তিনি মানুষকে নিযুক্ত করেছেন। অন্য কথায় বলা যায় যে, শাসকের প্রতিনিধি শাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মালিকানা ও রক্ষক স্বত্বকে ব্যবহার করেছে সে মহা অপরাধী এবং সে প্রতিনিধিও মহা অপরাধী গণ্য হবে যে, শাসক প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর মধ্যে কোন একটি ক্ষমতাকেও ব্যবহার করেনি বরং তিনি যেসব ক্ষমতা দান করেছেন তার মধ্য থেকে কোন ক্ষমতাকে অনর্থক নষ্ট করেছে, তার উপায়-উপাদানের সাহায্যে কাজ নেবার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে সে কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যা পালন করার হুকুম শাসক তাকে দিয়েছিল। আবার এ ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির সমাজ জীবন এমন কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমস্ত মানুষ অর্থাৎ আল্লাহর সকল খলীফা আল্লাহ কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত যাবতীয় কর্তব্য আদায় করার জন্যে পরস্পরের সহযোগী হয়ে যায় এবং সামাজিক ও তমদ্দুনিক ব্যবস্থায় কোন এমন জিনিস সক্রিয় থাকে না যার কারণে একজন মানুষ অন্য মানুষের অথবা একদল মানুষ অন্য দলের খেলাফতকে কার্যত খতম করে দেয় অথবা তার প্রবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে অবশ্যি শুধু একটি অবস্থায় এটি হতে পারে—যখন একজন বা একদল মানুষ মানুষের খেলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের আসল শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হয়।

খেলাফতের ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষের জন্যে এ নৈতিক পথের উদ্ভব হয়। মানুষের নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য এবং তার যাবতীয় কর্ম ও প্রচেষ্টাও এ ধারণার মাধ্যমে একেবারে অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্ধারিত হয়। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের নিযুক্তি স্বতস্ফুর্তভাবে একথাই দাবী করে যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার যতটুকুন অংশকে আল্লাহ্ মানুষের সংগে সম্পর্কযুক্ত করেছেন ততটুকুন অংশে আল্লাহর আইন জারি করা, আল্লাহর ইচ্ছানুসারে শান্তি, সুবিচার ও সংস্কার ব্যবস্থা কায়েম করা ও কায়েম রাখা ঐ ব্যবস্থার মানুষ ও জিন জাতির শয়তানরা যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাকে দাবিয়ে দেয়া ও নির্মূল করা এবং সেসব সৎগুণকে অত্যধিক

সম্প্রসারিত করা যেগুলো আল্লাহর প্রিয় এবং যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ নিজের পৃথিবী ও প্রজা সাধারণকে সুসজ্জিত দেখতে চান—এ উদ্দেশ্যের জন্যেই প্রত্যেকটি মানুষ—যার মধ্যে আল্লাহর খলীফা হবার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে—তার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে। এ উদ্দেশ্যে শুধু যে কেবল ঐসব উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে, যা বিলাসপ্রিয়, বস্তুবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্য বাজে জিনিসের আনুগত্যকারীরা নিজেদের জীবনের জন্যে নির্ধারিত করেছে, তা নয় বরং এটি ঐসব নিরর্থক উদ্দেশ্যকেও জোরেশোরে অস্বীকার করে যা আধ্যাত্মিকতার একটি ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে ধর্মবাদীদের নির্ধারিত করে রেখেছে। এ উভয় ভ্রান্ত চরম পন্থার মাঝামাঝি খেলাফতে ইলাহিয়ার ধারণা মানুষের সম্মুখে এমন একটি উন্নততর ও পবিত্রতর জীবনোদ্দশ্য সংস্থাপিত করে যা তার সমগ্র শক্তি ও যোগ্যতাকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কার্যকরী করে এবং একটি সৎ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির কাজে তাদেরকে ব্যবহার করে।

মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যে ইসলাম আমাদেরকে যে বুনিয়াদ দিয়েছে, তাহলো এই। ইসলাম কোন একটি জাতির সম্পত্তি নয় বরং সমগ্র মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে এক যোগে একে লাভ করেছে এবং সমস্ত মানুষের কল্যাণই এর উদ্দেশ্য। এ জন্যে যে ব্যক্তি নিজের ও মানব জাতির কল্যাণকামী তাকে অবশ্যি চিন্তা করা উচিত যে, মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যে ইসলাম আমাদেরকে যে বুনিয়াদগুলো দিয়েছে সেগুলো ভাল, না আধ্যাত্মিকতাবাদী ধর্ম বা দার্শনিক মতগুলো যা দেয় তাই ? কারুর মন সায় দেয় যে, নৈতিকতার জন্যে এ বুনিয়াদগুলো নির্ভুলতর, তাহলে এ বুনিয়াদগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার কোন জাহেলী বিদ্বেষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।